ঘটনাপ্রবাহ

টেলিফোনটা সেই সকাল থেকে বেজে চলেছে মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিয়ে। শমিতা প্রতিবার সাইড টেবিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে টেলিফোনে ফুটে ওঠা নম্বরটা দেখে নির্বিকার মুখে সরে এসেছে। একই নম্বর থেকে ফোন আসছে প্রতিবার। লাইনের ওপারে নির্ঘাৎ অনুরাধা সামন্ত। শমিতার বাল্যসখী, সহপাঠী।

গর্দানিবাগে একই পাড়ায় থাকতো ওরা। শমিতার বাবা পাটনা কলেজে অধ্যাপক। অনুরাধার বাবা উকিল। গর্দানিবাগের বাঙালী পরিবারগুলির মধ্যে যাতায়াত ছিল। কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

শমিতা তার বাবা মা'র একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ায় দারুণ ঝোঁক। তিন বছর বয়সে বাংলা বর্ণপরিচয় ইংরিজী অ্যালফাবেট একেবারে মুখস্ত, স্লেটের দু'পিঠে নির্ভুল লিখে দিতো। মুখে মুখে নামতা শুনিয়ে দিতো দুই-এক্কে দুই থেকে পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ অবধি। এরপর ধাপে ধাপে প্রাথমিক সবক'টা ক্লাশের পড়া দ্রুত বাড়িতে শিখে নিয়ে যখন ক্লাশ টেনে স্কুলে অ্যাডমিশন নিলো, শমিতার বয়স তখন সবে তেরো পুরেছে। বয়স আন্দাজে লম্বা, বাড়ন্ত গড়ন। ওর থেকে বয়সে বড় মেয়েদের মাঝে দেখতে বেমানান লাগে না। কিন্তু হলে হবে কি, ওর বয়সটা তো সবাই জানে। সতেরো আঠারো ও আরও বেশী বয়সের সহপাঠীরা ওকে শিশুকাল থেকে দেখে আসছে প্রতিবেশী হিসাবে। তারা স্কুলে ওর সঙ্গে ব্যবহার করে ও যেন এখনও সেই ছোট্ট খুকুমণিটি। পাত্তাই দিতে চায় না ওকে, শমিতা লেখাপড়ায় ক্লাশের সবার সেরা হওয়া সত্ত্বেও।

শমিতা বই পড়তে ভালবাসে। বই পেলেই পড়ে শেষ করে ফেলে। বাড়িতে আলমারি বোঝাই বই। বাবা-মা নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই আনান। কোনও বই-ই বাদ দেয় না শমিতা। গোড়ার দিকে মা নজর রাখতেন। বড়দের বই ছোটদের না পড়াই ভাল। কিন্তু শমিতা এত দ্রুত বইগুলো পড়ে ফেলতো যে মানা করার সময় দিতো না। বড় বাড়ি, হাজারটা সংসারের কাজ আছে মা'র। মেয়ের খবরদারি করার সময় সীমিত। তাছাড়া অমন অসাধারণ মেধাবী মেয়েকে বাধা নিষেধে গণ্ডীবদ্ধ করা বাবা পছন্দ করেন না।

বাড়িতে শমিতার কোন সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল স্কুলে। ওর থেকে কম নম্বর পাওয়া মেয়েগুলো ক্লাশে যতক্ষণ পড়াশোনা চলতো ততক্ষণ শমিতাকে সমীহ করতো। বাকি সময়ে ওকে বালখিল্যের পর্যায়ে ফেলে দিতো। শমিতার অসহ্য লাগতো। অহর্নিশি কাঁটার মত বিঁধতো সহপাঠিদের এই স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা। তাদের চকিত ইঙ্গিত, কানাকানি, নিষিদ্ধ আলোচনা, রসালো রসিকতা সবকিছু চলতো নাবালিকা শমিতাকে বাদ দিয়ে। শমিতা যেন বড়দের সুসম্বদ্ধ টিম'এ "খেলা খেলা" সদস্যের মত। এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে শমিতাকে উদ্ধার করলো অনুরাধা।

অনুরাধার দাদা শুভেন্দু শমিতার বাবার প্রাক্তন ছাত্র। সেই সুবাদে শুভেন্দু মাঝে মাঝে শমিতাদের বাড়ি যেতো। বৈঠকখানায় শমিতার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে আসতো। শমিতার বাবা প্রফেসর দত্ত কন্যাগর্বে গর্বিত ছিলেন। যাকে পেতেন তাকেই তাঁর মেয়ের অসামান্য প্রতিভা এবং এ-হেন অসাধারণ মেধাবী সন্তানের জন্য যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সঠিক দিঙনির্ণয়ের গুরুদায়িত্বের কথা বলতেন। শুভেন্দু বাড়ি গিয়ে এসব কথা ভাই বোনেদের শোনাতো।

অনুরাধাদের বৃহৎ পরিবার। আটটি ভাই বোনের মধ্যে শুভেন্দু সবার বড়, অনুরাধা সপ্তম। শুভেন্দু অনুরাধার থেকে বারো বছরের বড়। অনুরাধা তখন ক্লাশ ইলেভ্নে উঠেছে। বিহারে সে সময় ইলেভন্ ক্লাশ পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে হত। অনুরাধা উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পা দিয়েছে। শুভেন্দুর বয়স বত্রিশ।

অনুরাধা স্কুলে এসে বন্ধুদের বলতো ওর বড়দা শুভেন্দু নাকি শমিতার প্রশংসায় উচ্ছসিত। শমিতার এসব কথা শুনতে প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি হত। কিন্তু যখন দেখলো এই ব্যাপারে সহপাঠীদের প্রতিক্রিয়া তারই অনুকূলে বইছে, শমিতা খুশিই হল এবং যথাসম্ভব ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো।

ইলেভন্ ক্লাশের গোড়ার দিকে ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছিল। পুরোপুরি দানা বেঁধে উঠতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ লাগলো। সহপাঠীদের মধ্যে কার মাথায় যে প্রথমে কথাটা এসেছিল যে শমিতার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে এবং কোনও যে সে চ্যাংড়া ছোকরা নয়, এক বত্রিশ বছর বয়স্ক চাকুরে ভদ্রলোক শমিতার প্রণয়প্রার্থী

----। এখন ভাবতে খারাপ লাগে, লজ্‌জা ও পশ্চাতাপে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু তখন শমিতা এই অলীক গুজব খণ্ডন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। বরং তার কাছে এই নতুন ব্যাপারটা দৈব কৃপা বলেই মনে হয়েছিল। ক্লাশে দলচ্যুত কোণ-ঠাসা হয়ে থাকতে ভীষণ খারাপ লাগতো তার। স্কুল জীবনের অভিশাপ বলে মনে হত এতকাল। হঠাৎ যেন শাপমুক্ত হল শমিতা। একজোটে তাকে বুকে টেনে নিলো সবাই। ক্লাশের ফার্স্ট-গার্ল শমিতা যা পারেনি, "প্রেমিকা" শমিতা হেলায় ক্লাশ সুদ্ধু মেয়ের মন জয় করে ফেললো। এরপর শমিতাকে পায় কে। কি আনন্দ! কি আনন্দ!

শমিতা যথাযথ আচার আচরণ চালিয়ে গেল - মৃদু সলাজ হাসি, চোখ নীচু করে নীরব থাকা ইত্যাদি। শমিতা ভেবেছিল এখানেই ইতি। বৃত্তের পুরো পরিধিটা আন্দাজ করতে পারেনি সে। অনুরাধা যে বাড়ি ফিরে ক্লাসের আলাপ আলোচনা ও শমিতার ইতিবাচক ভাবভঙ্গির কথা ফলাও করে শুভেন্দুকে বলতো সে খবর শমিতার অজানা ছিল।

এরপর শুভেন্দু শমিতার মুখোমুখি হবার প্রয়াস করতে লাগলো। গর্দানিবাগের বাঙালী সমাজ তখনো মধ্যযুগের রীতি- রেওয়াজের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসেনি। শমিতার বাবা তাঁর অসাধারণ মেধাবী কন্যাকে সকল বাধানিষেধ থেকে মুক্ত রাখতে চাইলেও সর্বাঙ্গীণ আবহাওয়া প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার অনুকূল ছিল না। শুভেন্দু তক্কে তক্কে থাকতো তার আরাধ্যা শমিতার সান্নিধ্য লাভের আশায়। দুই পরিবারের মধ্যে আসা যাওয়া থাকলেও ওদের একত্র হবার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। অনুরাধাদের বাড়ি সর্বদাই লোকে লোকারণ্য। সাধারণ সময়েই বাবা মা আটটি ভাইবোন ও গোটা দুয়েক ঝি চাকর (তখনকার সস্তা-গণ্ডার দিনে সবার বাড়িতেই দু-একজন কাজের লোক থাকতো)।

শুভেন্দু প্রফেসার দত্তের সঙ্গে দেখা করতে এলে আগে যদি বা শমিতাকে ক্কচিৎ-কখনও এক ঝলক দেখতে পেতো, এই বয়ফ্রেন্ড সংক্রান্ত গুজবটা চালু হবার পর থেকে তাকে ধারে কাছেই পাওয়া যেতো না আর। ইদানীং সুধাংশু ওদের বৈঠকখানায় পা রেখেছে খবর পাওয়ামাত্র শমিতা খিড়কি দোর দিয়ে উধাও হয়ে যেতো। পাড়ায় অন্য কারো বাড়ি চলে যেতো। নিদেনপক্ষে ছাদে হাওয়া খেতে যেতো কিংবা কলঘরে গা ধুতে ঢুকে পড়তো।

একবার শুধু এত করেও এড়ানো যায়নি শুভেন্দুকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আর ক'দিন পরেই কলকাতায় যাবে শমিতা, বাবা-মা'র সঙ্গে মামা বাড়িতে ছুটি কাটাতে। বিকেলে শুভেন্দু আসবে বাবার মুখে খবরটা পেয়েই শমিতার মনে পড়ে গেল কদমকুঁয়ায় নীলিমাদিকে দু'টো বই ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। রিক্সা নিয়ে আগে ভাগে বেরিয়ে পড়লো যাতে যাওয়ার মুখে শুভেন্দুর মুখোমুখি না পড়তে হয়।

নীলিমাদির ওখানে চা জলখাবার খেয়ে অনেক গল্পগাছা করে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ির কাছে এসে রিক্সাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লো শমিতা। গাছ-গাছালি ভরা বড় কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বৈঠকখানার দরজা। বারান্দায় শেড দেওয়া বিজলি বাতির আলো বারান্দা ও সামনের খানিকটা আলোকিত করে রেখেছে। গেটে ঢুকেই কিছুটা রাস্তা আধো অন্ধকারে ঢাকা। শমিতা গেট বন্ধ করে বাড়ির দিকে এগোতে যাবে হঠাৎ শুভেন্দু অন্ধকারে ভুঁইফোড়ের মত আবির্ভূত হয়ে তাকে জাপটে ধরলো। শুভেন্দুকে দূর থেকে অনেকবার দেখেছে শমিতা কিন্তু ভাল করে খেয়াল করে দেখেনি। শুভেন্দুর সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে বন্ধুদের ভিত্তিহীন ঠাট্টা-তামাশার দরুন লাভবান হলেও শুভেন্দু সম্পর্কে শমিতার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা বা কৌতূহল ছিল না কোনদিন।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত সন্ধ্যায় শুভেন্দুর মেদ-বহুল সুবিশাল বক্ষ জুড়ে ঘামের তীব্র গন্ধে শমিতার গা গুলিয়ে উঠলো। এক ঝটকায় তার আচমকা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শমিতা তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে পড়লো। শুভেন্দু বাধা দিলো না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর গেট খুলে বাইরে চলে গেল।

কলকাতায় পৌঁছে শমিতা বললো সে কলকাতার কলেজে পড়তে চায়। ম্যাট্রিকের রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছিল। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল শমিতা। এরপর এম.এ. পড়লো দিল্লী থেকে। জামিয়া মিলিয়াতে জার্নালিজম্'এ ডিগ্রী নিয়ে নামকরা খবরের কাগজে কাজ নিলো। আজ সে একজন প্রতিষ্ঠাবান খ্যাতনামা জার্নালিস্ট।

গর্দানিবাগের স্কুলজীবনের সেই অতি তুচ্ছ হাস্যকর ছলনার কথা ভুলেই

গিয়েছিল শমিতা। তারপর এত বছর পরে এই সেদিন - মাত্র মাস ছয়েক আগে - হঠাৎ অনুরাধার সঙ্গে দেখা। শমিতার ছোটমাসি গাজিয়াবাদে থাকে। সেখানে মাঝেমধ্যে যায় শমিতা - সবসুদ্ধু বার তিনেক যাওয়া হয় বছরে। সেবার মাসির আগ্রহে পুজোর মধ্যে একদিন গেছিল। গাজিয়াবাদের পুজোমণ্ডপে অনুরাধার সঙ্গে দেখা হল। অনেক মোটা হয়ে গেছে অনুরাধা। শমিতাকে দেখেই দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো। চকিতে বহু বছর আগের সেই অযাচিত অবাঞ্ছিত আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে গেল শমিতার। অনুরাধার আলিঙ্গনে ঘামের বদ্ গন্ধের বদলে কাসাণ্ড্রা রয়ালের মিষ্টি সুবাস।

অনুরাধা শমিতার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার নিলো। এরপর ওদের বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। অনুরাধার কাছে অদ্ভুত সব খবর শুনলো শমিতা : শুভেন্দুর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। তার বাবা-মা ছেলের বিয়ে দেবেন বলে পাত্রী খুঁজছেন। শুভেন্দু গোঁ ধরলো সে বিয়ে করবে না। অনুরাধাকে আড়ালে কারণটা বললো শুভেন্দু। সে শমিতাকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। দাদার নির্দেশে অনুরাধা বাবা-মা'কে গিয়ে একথা জানালো। তারা তো মেয়েকে এই মারে কি সেই মারে!

শুভেন্দু বাবা-মার সঙ্গে সরাসরি এবিষয়ে কথা বলে না। বোনের মারফৎ বলে পাঠালো যে সে বাবা-মা'র অমতেই শমিতাকে বিয়ে করবে। অনুরাধা নাকি শুভেন্দুর দৌত্য নিয়ে শমিতাদের বাড়িতে গিয়ে শমিতার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিল। শমিতার বাবা প্রথমে হকচকিয়ে গেছিলেন।

তারপর বললেন, "বাবা-মা'র অমতে বিয়ে করা কি তোমার দাদার উচিত হবে? ওঁরা কত মনোকষ্ট পাবেন সেটা তোমার দাদাকে ভেবে দেখতে বোলো।"

তদ্দিনে শুভেন্দুদের বাড়িতে ধুন্ধুমার পড়ে গিয়েছে। শুভেন্দুর মা কখনো দেয়ালে মাথা কুটছেন, কখনো গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর বাবা অন্নজল ত্যাগ করে শয্যা নিয়েছেন। অবশেষে শুভেন্দু তার বাবা-মা'র পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করলো। বিয়ের মাস দুয়েক পরে বউ নিয়ে পৃথকান্ন হল শুভেন্দু এবং বছর খানেকের মধ্যে স্থানান্তরে চাকরি নিয়ে চলে গেল। এরপর মা-বাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি সে।

শমিতা অবাক হয়ে শুনে গেল শুধু। আশ্চর্য, বাবা কোনদিন এ বিষয়ে আভাস মাত্র দেননি শমিতাকে। শুভেন্দু সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেননি। বাবা

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন আসল ব্যাপারটা কি। হঠাৎ শমিতার মনটা হু-হু করে উঠলো। বাবার অভাব নতুন করে বুকে বাজলো তার, সেই সঙ্গে মায়ের অভাবও। কত ভাগ্যবলে অমন বাবা-মা পেয়েছিল শমিতা, যারা নিঃশর্ত ভালবাসা দিয়েছিল তাকে, দিয়েছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ----।

অনুরাধা বললো ওর বাবা বছর দুয়েক আগে মারা গেছেন। মা হাউসখাসে থাকে, সম্পূর্ণ একা। গর্দানিবাগের বাড়িটা বিক্রি করে হাউসখাসে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনেছিলেন বাবা। ওর বাকী ভাই-বোনেরা যে যার নিজেদের মত আছে, বাবা-মা'র খোঁজ খবর বিশেষ নেয়নি কেউ। অনুরাধার স্বামী আর্মি থেকে আগে ভাগে অবসর নিয়ে এক প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে। কোম্পানির জেনেরাল ম্যানেজার সে। এই চাকরিটাতে মাইনে ভাল, তবে প্রচুর হ্যাপা। গাজিয়াবাদে বাড়ি কিনেছে ওরা। অনুরাধার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে বি.এস.সি. পড়ে, মেয়ে ক্লাশ টেনে। স্বামী চাকরির বাইরে এক মিনিটও সময় দিতে পারে না। সব কিছু সামলাতে হয় অনুরাধাকেই।

অনুরাধা হঠাৎ গলা নামিয়ে বলেছিল, "জানিস্ শেষ বয়সে বাবা-মা দু'জনেই তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল। তোর সঙ্গে দাদার বিয়েটা হলে দাদা অমন পর হয়ে যেতো না। মধ্যে থেকে তোর জীবনটাও নষ্ট হল ----।"

শমিতা ভীষণভাবে চমকে উঠে কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলো। নাঃ, আজ আর কিছু বলার উপায় নেই তার। কিছু বলে লাভ নেই। শুভেন্দুর সঙ্গে তার প্রণয়ের আখ্যান এদের সবার চোখে এক উচ্চাঙ্গের বিয়োগান্ত নাটক। রোমিও-জুলিয়েট, হীর-রান্ঝার প্রেমের পর্যায়ে পড়ে প্রায়। শমিতা যে মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়েছিল এখন আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। স্বেচ্ছাকৃত না হলেও তঞ্চকতা তঞ্চকতাই। ধুয়ে মুছে তাকে অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না। জীবনভোর এদের অযাচিত অনুকম্পা পিছু করবে তাকে, সেদিনের সেই অপ্রীতিকর স্বেদগন্ধের স্মৃতি ভেদ করে।

তবু অনুরাধার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হওয়ায় খুশি হয়েছিল শমিতা। প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছে তারা। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদ ভরা কত স্মৃতি জমা হয়ে আছে দুজনের মনে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন আবার ফিরে আসে দুই বন্ধুর অবকাশ কালের স্মৃতিমন্থনে।

গোড়ার দিকেই শুভেন্দু-সংক্রান্ত খবরাখবর শমিতাকে জানিয়ে দেবার পর আর ওসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি অনুরাধা। অনুরাধা ধরেই নিয়েছে শুভেন্দু সম্পর্কে কথাবার্তা নিদারুণ বেদনাদায়ক শমিতার পক্ষে। শুভেন্দুকে পেলো না বলেই আজ এই একক জীবন শমিতার। তার হৃদয় গভীরে, অন্তরে বাহিরে, তার সারা মনের আকাশ জুড়ে শুভেন্দু বিরাজ করছে আজও ইত্যাদি ইত্যাদি। শমিতা অনুরাধার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এই প্রসঙ্গটা বাদ দেবার জন্যে। আজ এত বছর পরে - কমপক্ষে তিরিশ বছর - আসল ঘটনা প্রকাশ করার কোন ইচ্ছা নেই শমিতার। ভীষণ একটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স হবে সেটা। শমিতা তা চায় না। শুধু তার রুচিতে বাধবে বলেই নয়, সাধারণ মানবিকতাবোধেও বাধবে।

অনুরাধার সঙ্গে যোগাযোগের পর ক'টা মাস ভালই কেটেছে। এর মধ্যে বার ছয়েক দেখা হয়েছে ওদের। আগে থেকে পরিকল্পনা করে, একটু অন্য রকম পরিবেশে। প্রতিবার বিভিন্ন জায়গায়। শমিতার কর্মব্যস্ত ঘটনাবহুল জীবনের সঙ্গে অনুরাধার গতানুগতিক শ্লথ মন্থর জীবনধারার কোনও মিল নেই। তবু শমিতার মন্দ লাগে না অনুরাধার ঘর-গেরস্থালির খুঁটিনাটি সংবাদ। একটানা বলে যায় অনুরাধা, আর শমিতা নিঃশব্দে শুনতে থাকে। একটা ঘুম-ঘুম প্রশান্ত আবেশের ছোঁয়া লাগে মনে।

এইবারেই ব্যতিক্রম। ছত্তিশগড়ে আটদিন কাটিয়ে সবে গতকাল নিজের ডেরায় ফিরেছে শমিতা। আটদিন নির্মম সংহার-লীলা দেখেছে ক্রমান্বয়েঃ- আতঙ্কবাদীদের চক্রান্তে গাড়িবোঝাই পুলিসদলের, পুলিসের হাতে আতঙ্কবাদী ও আতঙ্কবাদী সংশ্লিষ্ট জনমানুষের এবং শেষমেশ সর্বশক্তিমান দৈবের নির্দেশে আকস্মিক দুর্ঘটনায়। শেষোক্ত ঘটনায় শমিতারও মারা যাওয়ার কথা। নেহাৎ বাবা-মায়ের আশীর্বাদে অতি অদ্ভুতভাবে দুর্ঘটনার কবল থেকে প্রায় অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছে। শমিতার সহকারী ফটোগ্রাফার ছেলেটি সেখানেই রয়ে গেছে, ভস্মীভূত জীপের মাঝে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়।

এমত পরিস্থিতিতে অনুরাধার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে আটপৌরে ঘরোয়া আলোচনা ভাল লাগার কথা নয়। বরাতক্রমে অনুরাধারও সময়টা ভাল যাচ্ছে না ইদানীং। অনুরাধার মা নাকি নানা রকম বার্ধক্যজনিত মানসিক বিকারে ভুগছেন। মনে রকমারি যত ভয় ঢুকেছে আর অনুরাধাকে ফোনে ফোনে উত্ত্যক্ত করে মারছেন। গাজিয়াবাদ থেকে হাউজখাস অনেকটা দূর। হুট করে যাওয়া যায়

না যখন তখন। আগে সপ্তাহান্তে একবার যেতো। নিজেদের গাড়িতে। ছেলেমেয়ে স্বামীস্ত্রী সারাটা দিন ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতো আবার। বছর দুয়েক ধরে একেবারেই সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠে না। যদিও বাবা গত হওয়ার পর এখন যাওয়ার প্রয়োজন আরও বেশী। অনুরাধার স্বামীর কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই। অনুরাধা ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারে আকাশ ছোঁয়া ট্যাক্সিভাড়া হওয়া সত্বেও। কিন্তু ছেলে বা মেয়ে কেউই সঙ্গে যেতে চায় না। বুড়ি দিদিমার নিরস সান্নিধ্য পছন্দ নয় তাদের। তাছাড়া শনি-রবিবার ওদের হাজার রকম প্রোগ্রাম থাকে। অনুরাধার একা অত দূরে ট্যাক্সিতে যেতে ভয় করে। রোজদিন মেয়েদের উপর কত রকম বীভৎস অত্যাচার ঘটে যাচ্ছে রাজধানী ও রাজধানী-ঘেঁসা এলাকাগুলোতে। নবজাত শিশু থেকে থুড়থুড়ি বুড়ি - কেউ নিরাপদ নয় মানুষ-নেকড়েগুলোর কবল থেকে ----।

আজ প্রায় তিন-চার মাস হাউজখাসে মা'কে দেখতে যেতে পারেনি অনুরাধা। ফোনেই কথাবার্তা হয়েছে। কথাবার্তা মানে ধৈর্যভরে মায়ের কাল্পনিক যত ভয়ের ফিরিস্তি শোনা। কানের পোকা নড়ে যাবার দাখিল। হাজার বলেও একটা সারাদিনের লোক রাখতে রাজি করাতে পারেনি মা'কে। বাড়িতে একটা অল্প-বয়সী মেয়ে কিংবা মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক থাকলে আর অত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না মা'কে। কিন্তু মা'কে বোঝাবে কে? অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খুনে গুণ্ডা কেউ রাত-বিরেতে ঘরে ঢুকে পড়ে যদি? কিংবা স্ত্রীলোকটির স্বামীই হয়তো খারাপ লোক। এ বরং বেলাবেলি কাজ সেরে মেয়েটা বাড়ি চলে গেলে উনি দরজায় হুড়কো, তালা, নাইট ল্যাচ, গোডাউন লক যেখানকার যা পরিপাটি করে লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ইদানীং নতুন এক উপসর্গ শুরু হয়েছে। রাত-বিরেতে নানা রকম সন্দেহজনক আওয়াজ শোনেন অনুরাধার মা। রাতভোর। অগণিত বার। আগে রাত দুপুরে অনুরাধাকে ফোন করতেন - রাত বারোটা, রাত দু'টো, যখন তখন। অনুরাধার স্বামী দারুণ বিরক্ত হ'ত। মা'কে অনেক বকাবকি করে রাত-বিরেতে ফোন করা থেকে বিরত করতে পেরেছে অনুরাধা। কিন্তু সে আর ক'দিন? এখন আবার মা'র ভয় এক ধাপ উপরে উঠেছে। তাঁর ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে নাকি মাঝে মাঝেই গভীর রাতে ছায়ার মত নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ। উনি স্পষ্ট দেখেছেন ----।

ছত্তিশগড় থেকে ফিরে এসে অবধি মন মেজাজ ভাল নেই শমিতার। অনুরাধা যে তার সঙ্গে নিজের মা'র এই সব কল্পিত ভয় নিয়ে আলোচনা করবে,

স্বামীর সঙ্গে এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে রাগারাগির কথা ওকে বলে হালকা হ'বে তা শমিতা নিশ্চিতভাবে জানে। এ কারণেই সে বারবার টেলিফোনে ফুটে ওঠা নম্বরটা দেখে সরে আসছে। এই মুহূর্তে ওর এতটুকু ইচ্ছা নেই ওই সব তুচ্ছ অবান্তর আলোচনায় যোগ দিতে।

রাতটা আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে গেল। সাতটা নাগাদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো শমিতা। সামনের দরজা খুলে খবরের কাগজ আনলো। তারপর গ্যাসে কফির জল বসিয়ে দিলো। খানিক পরে এক হাতে কফির কাপ ও অন্য হাতে কাগজ নিয়ে বারান্দায় এসে একটা আরামচেয়ারে বসে খবরের কাগজখানা মেলে ধরলো। একটা খবরে এসে দু'চোখ আটকে গেল তার। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো আধ কলাম জুড়ে ফলাও করে লেখা খবরটাকে। পরশু রাত্রে ঘটেছে ব্যাপারটা, গতকাল বেশ বেলায় জানাজানি হয় তাই গতকালের কাগজে ছাপা যায়নি। হাউজখাসের একটা দোতলা ফ্ল্যাটে এক বৃদ্ধা খুন হয়েছে। দু'বছর হ'ল স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, বিধবা একাই থাকতো ফ্ল্যাটে। কাল সকালে অনেক বেলা অবধি দরজা খোলেনি। ঠিকে কাজের লোক এসে ডাকা-ডাকি করে সাড়া না পেয়ে অন্য বাড়ি কাজ করতে গেছে। ভেবেছে মাতাজী বোধহয় বাথরুমে আছে। ঘণ্টা দুয়েক পরে এসে আবার যখন মাতাজীর সাড়া পায়নি প্রতিবেশীদের জানিয়েছে। তারাই পুলিশে ফোন করে।

বৃদ্ধার নাম সুশীলা সুর। অনুরাধার মা। গলাকাটা অবস্থায় শোবার ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিলেন। আততায়ীর প্রবেশ পথ দোতলার জানলা। নীচের বাড়ির বাসিন্দারা তাদের শোবার ঘরটা সম্প্রতি হাত দুয়েক লম্বা করে নেওয়ায় উপরের ফ্ল্যাটের জানলার নীচে চওড়া এক ফালি জায়গা তৈরী হয়েছে। নিশীথ রাতে আততায়ী সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের যন্ত্রপাতি দিয়ে অনায়াসে জানলার গ্রীল কেটে সুশীলা সুরের ঘরে ঢুকেছে। সুশীলা সুরের ঘরে অপর্যাপ্ত সোনাদানা পুঁজিপাতি ছিল না। মাস খরচের টাকা, সেলফোন ও টুকিটাকি জিনিসপত্র চুরি গেছে কেবল। সিনিয়র সিটিজেনদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নতুন করে বিবৃতি দিয়েছেন পুলিসের অধিকর্তারা।